অষ্টম অধ্যায়

সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্য

অষ্টম অধ্যায়

সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্য

জগৎ পরিবর্তনশীল, জীবন পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীল মনুষ্য সমাজ ও সংস্কৃতি। পরিবর্তন ও পরিশীলনের মধ্যে দিয়েই মনুষ্য সমাজ অতীত অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এই পরিবর্তন যেমন সত্য, তেমনি সত্য পরিবর্তনের মধ্যে এক ঐক্যসূত্র। সমাজে বিবর্তন ঘটলেও তাই একটি জাতির ঐতিহ্যমূল সুপ্ত অবস্থায় থেকেছে সমাজের অতীত ইতিহাসে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মতই সংস্কার ও সংস্কৃতি সহজে বদলায় না। তাই বর্তমান জীবনযাপন ও সংস্কৃতির মূল সূত্রটির সন্ধান করতে হয় অতীত ইতিহাসের পাতায়।

খ্রীষ্ট্রীয় নবম-দশম শতাব্দীতে উদ্ভূত বাঙালী জাতি মধ্যযুগের কালসীমাকে অতিক্রম করে ঐতিহ্যগত জীবনচর্চা থেকে কতটা সরে এসেছে কিংবা বাঙালীর বর্তমান জীবনের ঐতিহ্যমূল কোথায় প্রোথিত রয়েছে— এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যায়ণে অত্যন্ত জরুরী। এই নিবন্ধের অন্তিম পর্যায়ে তাই বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্যমূল অন্বেষণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে যে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়েছিল বাংলাদেশের ভাগ্যও সেদিন থেকেই অন্য পথে পরিচালিত হয়েছিল। স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থার অভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মুঠি শিথিল হয়েছে; আর এই দুর্বল রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ, ক্রমাগত পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণে বাংলার কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এবং গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণে এই বর্গী হাঙ্গামার বিবরণ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় জনগণের সামান্যতম কর প্রদানের ক্ষমতাও ছিল না, কিন্তু স্থানীয় শাসকেরা বিলাস-ব্যসনের ব্যয়ভার জোগানোর জন্য প্রজাদের উপর করের বোঝা আরোপ করে। বাংলাদেশের এই চরম দুর্দিনে ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। আলিবর্দী খাঁ ও পরে সিরাজদ্দৌলা এই রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও আর্থসামাজিক দুর্গতি রোধ করতে সক্ষম হননি। বাংলার জনগণ সেদিন মুসলমান শাসনের প্রতি বিরূপ হওয়ায় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভ মাত্র দু'শ শ্বেতাঙ্গ সেনা ও পাঁচ'শ দেশীয় সিপাহী নিয়ে মুর্শিদাবাদ প্রবেশ করেন— এভাবে ক্রমশ বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হল, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হল। রাজশক্তির দ্রুত পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ঘনঘটা দেশের আর্থসামাজিক জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ গ্রাম বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল, ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতি ভূমি রচনা করেছেন আর বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তার ভয়াবহতার বিবরণ দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদের পতনের পর কোলকাতা বাংলার নতুন রাজধানীতে পরিণত হয় এবং বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়। কোলকাতা নব্যতন্ত্রের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। আর্থসামাজিক বিপর্যয়ে এক শ্রেণীর মানুষ লাভবান হয়েছিল, তারা গ্রাম ছেড়ে কোলকাতামুখী হয়ে পড়েছিল; তারা 'দিশি চাল' সম্পূর্ণরূপে না ছাড়লেও 'বিলিতি চালে' অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন ছড়াতেও সমাজ পরিবর্তনের এই অভিব্যক্তি রচিত হয়েছে। যেমন—

"ধন্য ওহে কলিকাতা, ধন্য ওহে তুমি, যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলেতের চাল; নকুলে বাঙালীবাবু হলো যে কাঙাল
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে, ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে।"[১]

ইংরেজ ব্যবসা-বাণিজ্য বা দেশ শাসনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন বৃত্তিধারী চাকুরীজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। হাতে কাঁচা পয়সা আসার ফলে এক শ্রেণীর মানুষ অর্থ-সম্পদে

প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। পরানুকরণের মধ্যে দিয়ে বিকৃত রুচি সম্পন্ন এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, তারা 'বাবু' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। সমকালীন সাহিত্যে তার পরিচয় আছে।

রাষ্ট্রনৈতিক এই পরিবর্তন জাতির সাংস্কৃতিক জীবনেও পালাবদল নিয়ে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ছাপাখানার প্রচলন। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ছাপাখানা স্থাপন করলেও এর দ্বারা মহতী উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। ১৮০০ খ্রীঃ ওয়েলেসলির উদ্যোগে ফোর্টউইলিয়াম কলেজ স্থাপন এবং ছাপানো বইয়ের প্রচলন শিক্ষাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। অতঃপর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও প্রেস থেকে জনক্লার্ক মার্শম্যানের উদ্যোগে বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ সময়কার বিশিষ্ট মনীষীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, নারী শিক্ষার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, জড়তা, অন্ধতার বিরুদ্ধে কিছু মানুষ প্রতিবাদী ভূমিকা নেয়। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় কুসংস্কার, ব্যাভিচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, ফলে সামাজিক মুক্তি আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আবির্ভূত হন রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই দুই যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব। কবিকঙ্কণের দৈববাদী যুগ তখন স্মৃতিতে পর্যবসিত, ভারতচন্দ্রের দোলাচলতা যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে। ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে দেশীয় সংস্কৃতি ও দেশীয় ইতিহাস ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ করার আইন পাশ হয়; বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাকাপাকি ভাবে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। দেশের কিছু সংখ্যক মানুষ পরিবর্তনশীলতায় আস্থা স্থাপন করে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিয়েছে। ইংরেজ শাসকও তাদের প্রগতিশীল ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভারতবাসীর আস্থা অর্জন করেছে। এভাবে সমাজদেহে যুগ পরিবর্তনের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসনের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবনেও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব পড়তে থাকে। বাঙালী ইতিপূর্বে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাজ্যস্থাপনে সহায়ক হলেও তাদের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেনি। এযুগে বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরীই নয়, তাদের চিন্তাধারা এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে নতুন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য করে এক নতুন ভাবধারায় বাঙালী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে। বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে একবিংশ শতকেও সেই পরিবর্তিত-বিবর্তিত ভাবধারাকে অবলম্বন করে বাঙালী এগিয়ে চলেছে।

ঊনবিংশ শতব্দী থেকে বাংলাদেশে নাগরিক সমাজ প্রাধান্য পেতে থাকে; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকেই শহুরে অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ছিল, কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতিই ছিল শহরের অভিজাত শ্রেণীরও আচরণীয়। ডঃ অতুল সুর লিখেছেন— "শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রথম সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করেনি। সাধারণ লোক নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক রয়ে গিয়েছিল।"[২] মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও কয়েক দশক পর্যন্ত গ্রামীণ সংস্কৃতিই বজায় ছিল। বিংশ শতাব্দীর দু'-তিন দশকে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ, ইউরোপীয় জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বাঙালীর জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসে। অবশ্য তার বেশীরভাগ প্রভাবই পড়ে শহুরে জীবনযাত্রার উপর। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে তার প্রভাব পড়লেও তা ছিল অনেক কম। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে গ্রাম বাংলার জনজীবনে পরিবর্তন হলেও বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে শহুরে জীবনে; কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্যমূল অন্বেষণ করতে হলে আমাদের গ্রামীণ সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে গ্রামীণ বাঙালী সমাজের যে চেহারা বিধৃত রয়েছে তার অনুসন্ধান করতে হবে।

বাঙালীর আহার-বিহার বা খাদ্য-রুচি প্রসঙ্গে আলোচনা করলে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক

যুগ পর্যন্ত প্রায় একই রকম খাদ্য প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রকৃত পৈঙ্গলের একটি কবিতাতে যে ভোজন চিত্র লভ্য, মঙ্গলকাব্যগুলি কিংবা চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে খাদ্যবোধের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অম্ল-মধুর-তিক্ত-কষায় চার রকমের খাদ্য আজও ভোজন প্রিয় বাঙালীর খাদ্য তালিকায় স্থান পায়। পিঠা-পায়েস, মিষ্টান্ন বিভিন্ন পালা- পার্বণ বা আত্মীয়ের সমাগমে আজও রান্নাঘরের শোভা বৃদ্ধি করে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে 'পাঁটা', 'পৌষপার্ব্বণ' কবিতাগুলি অষ্টাদশ শতকের বাঙালীর রসনাপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। বর্তমানে আর্থিক চাপ ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বিভিন্ন রকম ব্যঞ্জন রাঁধার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে; তাছাড়া জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনের কারণেও বর্তমানের শিক্ষিত বাঙালী অনেক বেশী স্বাস্থ্য সচেতন ও খাদ্য সচেতন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাঙালী আজও ভোজন প্রিয়। মাছ, মাংস, ডিম থেকে শুরু করে সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জির ব্যঞ্জন বাঙালীর প্রিয়। এক সঙ্গে একাধিক ব্যঞ্জন রাঁধার প্রবণতা হ্রাস পেলেও রন্ধনের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি বই হ্রাস পায়নি। বর্তমান গ্লোবালাইজেশনের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রন্ধন পদ্ধতিতে রান্না করা খাবার বাঙালীর হেঁশেলে স্থান পেয়েছে। বাজারে হরেকরকম রান্না শিক্ষার বইগুলিতে বা টি.ভি. চ্যানেলগুলিতেও হরেকরকম রান্নার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষণীয় পিৎজা, বার্গার, চাওমিন, চপ, কাটলেট ফাস্ট ফুডের প্রচলন থাকলেও বাঙালীর রসনা পরিতৃপ্তি ঘরোয়া রান্নায়। শাক-শুক্তো, ঝাল-ঝোল, টক, পিঠা-পায়েস বা বিভিন্ন রকম মাছ— ইলিশ, রুই, কাতলা, চিংড়ির কদর এতটুকু কমেনি, এবং তার যথার্থ স্বাদ-গন্ধ বাঙালী গৃহিণীর হাতের জাদুতেই। একদা 'মাছে ভাতে বাঙালী' এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল, বর্তমানেও এই প্রবাদটি নিরর্থক হয়ে যায়নি; যদিও উর্দ্ধমুখী মূল্যমান বিভিন্ন প্রকার মাছ সাধারণ বাঙালীর নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসু 'ভোজন শিল্পী বাঙালী' গ্রন্থে বাঙালীর রন্ধন বৈচিত্র্য ও অসামান্য মৌলিকতার উল্লেখ করেছেন; তাঁর 'তিথিডোর', 'গোলাপ কেন কালো' উপন্যাসে বাঙালীর ব্যঞ্জন বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাঙালীকে 'ভোজন শিল্পী'[৩] অভিধায় ভূষিত করেছেন।

বর্তমানে সময় সঙ্কীর্ণতার কারণেও বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন রান্নার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া বর্তমানের শিক্ষিতা নারীরা উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রান্নার সময় তাদের কম, তাই গ্রামীণ গৃহস্থ গৃহিণীদের কাছেই বাঙালীর ঐতিহ্যমূল অন্বেষণ করতে হবে। তবে মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত একালের পুরুষরাও রন্ধনে পারদর্শী এবং রন্ধন আজকের যুগে শিল্পে পরিণত হয়েছে। রন্ধনে পারদর্শী পুরুষরা আজকাল বড় বড় হোটেল ব্যবসায় পাচকের কাজ করে। বাঙালীর চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের যে পরিবর্তন হয়নি, তা বোঝা যায় বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাবারের দোকানগুলিতে ঘরোয়া খাবারের চাহিদা দেখে। পূজায় নাড়ু, মুড়কি, মোয়া, পৌষপার্বণে পাটিসাপটা, পায়েস, মালপোয়া, পুলি, পিঠা সবই খাবারের দোকানগুলিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সময় বেচাকেনার ভীড় দেখে বাঙালীর ঘরোয়া খাবারের জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালের বড়ি, আচার, কাসুন্দি হয়তো গৃহিণীরা তৈরী করতে ভুলে গেছে কিন্তু খাবারের দোকানগুলি থেকে চাহিদা মেটানো যায়। আজও গ্রামাঞ্চলের মা-দিদিমারা সযত্নে আচার, কাসুন্দি, ডালের বড়ি তৈরী করে। তবে একটা কথা বলা যায়, হয়তো বাজারের দৌলতে আমরা অর্থের বিনিময়ে আমাদের চিরাচরিত খাদ্যেই রসনা পরিতৃপ্ত করে থাকি কিন্তু তাতে মা-দিদিমার হাতের স্নেহস্পর্শ নেই।

বর্তমানে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রধানত মাটি ও পাথরের তৈরী বাসনপত্র ব্যবহার করত। ধনীরা কাঁসা ও সোনা-রুপার বাসনও ব্যবহার করত, কিন্তু বর্তমানে ঐ স্থানে অ্যালুমিনিয়াম, ষ্টেইনলেস ষ্টীল, কাঁচ ও পোর্সিলিনের বাসনপত্র ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া প্লাষ্টিকের বাসনপত্রও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি স্বল্পমূল্য, দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যবহার করাও সুবিধাজনক। নাগরিক জীবনে প্রেসার কুকার, ফ্রিজ ব্যবহৃত হচ্ছে;

উনুনের পরিবর্তে ষ্টোভ ও গ্যাস ওভেন ব্যবহৃত হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলেও ধনীরা এগুলি ব্যবহার করে থাকে। তবে লক্ষণীয় আজও গ্রামাঞ্চলে মাটি ও পাথরের বাসনপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, পাথর ও কাঁসার বাসনপত্র সমাদৃত হয় বাঙালীর ঘরে ঘরে। তবে একটা কথা বলা যায় নতুন নতুন জিনিসপত্রের ব্যবহার হলেও কিন্তু পুরানো দিনের জিনিসপত্র, যেমন— থালা-বাসন, হাঁড়ি, পাতিল, বাটি, ঘটি, গামলা, বাটা, ষ্টেইনলেস ষ্টীল বা অ্যালুমিনিয়াম এমনকি প্লাস্টিকেও তৈরী হচ্ছে, অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যবহারের পরিবর্তন খুব একটা হয়নি।

চাষবাসের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশের আপামর চাষপদ্ধতির পরিবর্তন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয়নি। আজও গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা হাল, গরু, লাঙল, জোয়াল, মই দিয়েই চাষ করে থাকে। গৃহস্থালী বা কৃষিকাজে সহায়ক অস্ত্রাদির ব্যবহার আজও অটুট। যুদ্ধ প্রবণতা প্রায় কমে যাওয়ায় প্রাচীনকালের অস্ত্রাদি অবশ্য ব্যবহার হয় না, তবে কামান, বন্দুক, গোলা বারুদ আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে যুদ্ধবিদ্যায় পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার অভিনব সংযোজন।

বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-পরিচ্ছদে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব পর্যন্ত বাঙালী পুরুষের প্রধান পোশাক ছিল ধুতি ও চাদর এবং মহিলাদের প্রধান পোশাক হল শাড়ী। পোশাকের বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে; এখন পুরুষরা ধুতি ও চাদরের পরিবর্তে শার্ট, প্যান্ট, কামিজ, পিরান, কোট, টাই, হ্যাট ব্যবহার করে থাকে। গ্রামাঞ্চলেও ধুতি-চাদর ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে, ধুতির মত সেলাই বিহীন বস্ত্রের স্থান দখল করেছে লুঙ্গি। বালকরা পাঁচহাতি ধুতি পরে না, হাফপ্যান্ট ব্যবহার করে। মেয়েরা শাড়ী ব্যবহার করলেও বাইরে চলাফেরার উপযুক্ত সালোয়ার- কামিজ, বিভিন্ন ধরনের অন্তর্বাস— সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার ব্যবহার করে। অনেকে পুরুষের শার্ট, প্যান্ট, পাজামা, ফতুয়া ব্যবহার করে থাকে। বালিকারাও আজ আর শাড়ী পরে না, ফ্রক বা চুড়িদার ও কামিজ পরে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে শাড়ীর ব্যবহার থাকলেও পাজামা, সালোয়ার, কামিজ পরাই পছন্দ করে। অনেকে সাহেবদের অনুকরণে নেকটাই, কোট ও টুপি ব্যবহার করে থাকে। পুরুষের প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, লুঙ্গি পরার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। মধ্যযুগে পুরুষরা প্রধানত খড়ম, চটিজুতা ব্যবহার করত, নারীরা সাধারণত নগ্নপদ থাকত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও পুরুষরা বাইরে চলাফেরার উপযুক্ত চটি, নাগরা জুতা, বার্নিশ করা জুতা ব্যবহার করত। বর্তমানে খড়মের ব্যবহার এক প্রকার নেই তৎপরিবর্তে বিভিন্ন উন্নতমানের জুতার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত মেয়েদের জুতা-মোজা ব্যবহারের চল ছিল না, এমন কি মেয়েদের জুতা-মোজা ব্যবহার সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ছিল। এ সময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে গ্রামের মেয়েরাও আর নগ্নপদ নয়। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।কিন্তু বাঙালীর ঐতিহ্যমূল মধ্যযুগের সীমানায় প্রোথিত রয়েছে, তাই আজও বাঙালী হিন্দুর বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পূজা-পার্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে ধুতি, চাদর, গামছা, খড়ম, মেয়েদের শাড়ী আবশ্যক; সেখানে কিন্তু শার্ট, প্যান্ট বা লুঙ্গি দন্তস্ফুট করতে পারেনি। হিন্দু সমাজপতিদের রক্তচক্ষু দেখে নয়, অজান্তেই আমরা ঐ সমস্ত পোশাক পরে থাকি।

বর্তমানে সোনা-রূপা বা অন্যান্য মণি-মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের মূল্য বৃদ্ধিতে সোনা-রূপার গহনা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে । শিক্ষিত মেয়েরা পথেঘাটে চলাফেরার জন্য গহনা পরে না, তবে গহনা পরার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে তা নয়। কোন উৎসব অনুষ্ঠানে লক্ষ করলেই তা বেশ বোঝা যায়। কোমরে গোট, নাকে নোলক, নথ, নাকছাবি পরার প্রবণতা কমে গেলেও বিভিন্ন অলঙ্কার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে বই হ্রাস পায়নি। মধ্যযুগে সোনা-রূপার মূল্য কম থাকায় নারীদের প্রচুর অলঙ্কার থাকত, একালেও ধনী পরিবারের নারীদের গহনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। তবে গহনা পরার প্রবণতা হ্রাস পায়নি, সোনা-রূপার গহনার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের ইমিটেশন সামগ্রী সোনার জলকরা গহনা, সিটিগোল্ড, ঝুটা মুক্তার গহনা ব্যবহার করে থাকে;

অনেকে উৎসব অনুষ্ঠানে পোড়ামাটির গহনাও ব্যবহার করে থাকে। পুরুষের গহনা পরার প্রবণতা প্রায় নেই, তবে এখনো বহু পুরুষ হার, আংটি পরে। হাতে বালা ব্যবহারের পরিবর্তে রিষ্টওয়াচ বা হাতঘড়ি ব্যবহার করে। শিশুদের গোট, বাজু ব্যবহার করতে দেখা যায়।

রূপচর্চা ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের প্রবণতা এতটুকুও কমেনি। বরঞ্চ একালের মেয়েরা অনেক বেশী রূপ-সচেতন। তাই রূপচর্চায় বিউটি কোর্স বা ফ্যাশন ডিজাইনের কোর্স করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে।তবে রূপচর্চার ঘরোয়া পদ্ধতি এখন অচল; মধ্যযুগে নারীরা গৃহেই রূপচর্চার উপকরণ তৈরী করে ঘষে মেজে নিজেদের রূপসী করে তুলবার চেষ্টা করত। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সাবান, শ্যাম্পু ছাড়াও রূপচর্চার উপকরণের অভাব নেই। বাজারগুলিতে ভেষজ ও রাসায়নিক উভয় প্রকার প্রসাধনের ছড়াছড়ি । বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, টি.ভি. চ্যানেলগুলিতে রূপচর্চার বিশেষ টিপস্ দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া শহরাঞ্চলে যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে বিউটি পার্লার, যেখানে রূপচর্চা করানো হয়। বর্তমানে বিবাহে কনে সজ্জা বা উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়েরা ঘরোয়া পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদি রূপচর্চা করেনা, বরঞ্চ পার্লারগুলিতে চট্জলদি তা সেরে নেয়। পুরুষরাও এবিষয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই।

বর্তমানে মেয়েদের লম্বা চুল রাখার প্রবণতা কিছুটা কমেছে, শহুরে মেয়েরা অনেকে বয়েজকাট্ করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খোপা বাঁধার দক্ষতা একালের মেয়েদের না থাকলেও পার্লারগুলিতে সহজেই তা করা যায়। পুরুষের চুল-দাড়ি কামাবার জন্য নাপিতকে আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয় না, শহরে ও গ্রামে সেলুনগুলিতে মানুষ ভীড় করে থাকে। চুল কাটাবার বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাঙালী সধবাদের অলঙ্কার হিসাবে শাঁখা-পলা, রুলি বা প্রসাধন হিসাবে সিন্দুর-আলতা পরার প্রবণতা সামান্য কমে গেলেও বলা যায় বেশীরভাগ মেয়েরা শাঁখা-সিন্দুরের পক্ষপাতী। গ্রামাঞ্চলে শাঁখা-সিন্দুর পরার প্রবণতা এতটুকু হ্রাস পায়নি, বাঙালীর চিরাচরিত সংস্কার এর মূলে রয়েছে বলেই তা কোন দিন মুছে যাওয়া সম্ভব নয়।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে বাদ্যযন্ত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হত তার অনেকগুলিই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, অনেকগুলির পরিচয় উদ্ধার আজ সম্ভব নয়; আরও কত রকমের বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল তার খবর কে রাখে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কত রকমের বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে তার নমুনা সংগ্রহ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হলেও ভারতীয় রাগ প্রধান সঙ্গীত, লোকসঙ্গীতে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রই গ্রহণযোগ্য।আবার বিবাহাদি অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে ইংরেজী ব্যাণ্ডের আড়ালে দেশীয় বাজনা হারিয়ে যেতে বসেছে, তবে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বা কীর্তন গানে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রই অপরিহার্য, সেখানে বিদেশী বাদ্যযন্ত্র অনুপযুক্ত।একালেও বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতে বাঙালীর মৌলিকতার কারণেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট প্রবাদ প্রচলিত আছে–'সাজা বাজা কেশ তিনোঁ বাংলা দেশ।'[৪] অর্থাৎ অঙ্গসজ্জা, বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ এবং কেশ বিন্যাসে বাংলাদেশের মর্যাদা সুবিদিত। একালেও আমরা এ বিষয়ে গর্ববোধ করতে পারি।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় মধ্যযুগের সঙ্গে এযুগের যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটে গেছে সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বেই ভারতবর্ষে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং ক্রমাগত বিস্তার লাভ করেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থা চরম উন্নতি লাভ করেছে। মধ্যযুগের গরুরগাড়ী. পালকি. দোলা, চতুর্দোল একালে স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে আজ দূর আর দূর নেই, সমগ্র পৃথিবীই ঘরের মধ্যে এসে গেছে।

সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমানে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। মধ্যযুগের

অবসানে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হলেও কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার-বিশ্বাস হ্রাস পায়নি। কুসংস্কার আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল বাঙালী সমাজকে। তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ-উচাটন, বশীকরণের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে তন্ত্র-মন্ত্র বশীকরণ এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে শ্যামা সুন্দরীর স্বামী বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহ করতে কপালকুণ্ডলা বনে গিয়েছিল। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় তো বটেই, শিক্ষিত নাগরিক সমাজ থেকেও বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার মুছে যায়নি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজের চেহারা দেখা যায়। আজও সাপে কামড়ালে ওঝা-গুণীনদের আগে ডাকা হয়, ফলে প্রতি বছর প্রচুর লোক মারা যায়। আদিবাসী সমাজে ডাইনীপ্রথা ভয়ানক ভাবে প্রচলিত। এখনও শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত গ্রামীণ বাঙালী সমাজে তন্ত্র-মন্ত্র-বশীকরণ বা জাদুশক্তির প্রতি বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। সন্তানের মঙ্গল কামনায়, ভূত-প্রেতের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আঁতুরঘরে গোমুণ্ড স্থাপন করা হয়, একখণ্ড লোহা সঙ্গে রাখা হয়। বিবাহের পর এক বৎসর কাল নানা ধরনের বিধিনিষেধ পালন করতে হয়। জলপড়া, তেলপড়া, ধুলোপড়া ইত্যাদি করণ প্রক্রিয়া দ্বারা বশীকরণ করা বা সর্বনাশ করা বা রোগ সারানো যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। আরোগ্য কামনায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, বৃষ্টি কামনায় বৃক্ষ বিবাহ, ব্যাঙের বিবাহ এমন কি বন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বিবাহের উদাহরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের পাথর ধারণ, পশুর চামড়া, শিং আংটি ও মাদুলিতে ধারণ করলে মঙ্গল হয়, শনির কু-দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। শিক্ষিত সমাজেও বহু ব্যক্তি আংটিতে, মাদুলিতে ঐগুলি ধারণ করে থাকে। ওঝা, গণৎকার, দৈবজ্ঞও জ্যোতিষীদের প্রতি বিশ্বাস এতটুকুও কমেনি। বিভিন্ন মন্দিরে দেয়াসী বা সেবায়েত বা জ্যোতিষীরা ভাগ্য গণনা করে মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতিবিধান করে থাকে। শিক্ষিত বাঙালীরও এতে বিশ্বাস রয়েছে, তা বোঝা যায় সংবাদপত্র বা টি.ভি. চ্যানেলগুলিতে দৈনিক রাশিফলের বিচার, কররেখা গণনার দ্বারা ভাগ্যফল নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত থেকে। পাঁজি-পুথির প্রতি বিশ্বাস আজও অটুট; পাঁজি দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, লগ্ন স্থির করা হয়। হাঁচি-টিকটিকির বাঁধন, কাক চরিত, পশুপাখির আচরণ বা অঙ্গ স্পন্দন চরিত্র অনুযায়ী শুভাশুভ নির্ণয়ের প্রতি বিশ্বাসও মুছে যায়নি। সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের দিন হাঁড়ি-পাতিল ফেলে দেওয়ার প্রবণতা গ্রামীণ সমাজে ও অশিক্ষিত- অন্ধ বিশ্বাসে ভরপুর মানুষের মধ্যে আজও অটুট। গৃহে মৃত্যু হলে হাঁড়ি ফেলা, হবিষ্য করা আজও হয়ে থাকে। তবে এই প্রবণতাগুলি অপেক্ষাকৃত কমে আসছে।

বাঙালী সমাজে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' আজও প্রবাদবাক্য হিসেবে প্রচলিত। বিভিন্ন ধরণের বার-ব্রত পালনের প্রবণতা বর্তমানে অনেকটাই কমে গেছে ঠিকই তবে এখনও নবান্নে নতুন চালের অন্নগ্রহণ, পৌষপার্বণে পিঠে-পুলি করা, অরন্ধনে পূর্বদিনের রাঁধা অন্ন গ্রহণ করা,. শ্রী পঞ্চমীতে কড়াই সেদ্ধ করে শীতলষষ্ঠীতে ভক্ষণ করা, চৈত্র সংক্রান্তিতে যবের ছাতু ভক্ষণ করা, বৈশাখ মাসে বসুধারা ব্রত পালন করা হয়। জামাইষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, শীতলা অষ্টমী, অম্বুবাচীতে বিধবাদের নিয়মকানুন পালন ও আগুনের সংস্পর্শহীন খাদ্যগ্রহণ, একাদশী ব্রত, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী ব্রত. ইতুর ব্রত, সুবচনীর ব্রত, দশহরায় ফলার ভোজন, শিবরাত্রিতে ও শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার প্রবণতা কমে যায়নি। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানের খামতি শিক্ষিত জনসমাজেও পড়েনি। আবার বিপত্তারিণী, সন্তোষী মাতা, বাবা লোকনাথের মত নতুন দেবতারা ব্রতের দেবদেবীর স্থান দখল করে নিয়েছে।নবজাতকের জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুতে আচার পালন আজও হয়ে থাকে। নারীর রজঃ অনুষ্ঠান পালন আজ হয় না. স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নার্সিংহোমে সন্তানের জন্ম হওয়ায় প্রাথমিক আচারগুলি পালন করা হয় না, কিন্তু প্রসূতির সাধভক্ষণ, নবজাতকের জন্মের পর ষষ্ঠীপূজা ও নামকরণ অনুষ্ঠান করা হয়। হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের প্রচলন কমে গেলেও অন্নপ্রাশন পালন করা হয় । বিয়ের আগে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয়। বিবাহের আচারগুলি হয়ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে. তবে গায়েহলুদ. নান্দীমুখ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান যথাক্রমে পালিত হয়।

তবে কিছু কিছু আচার যেমন— বিবাহ উপলক্ষে নাড়ু ভাজা, ছাদনা তলায় নাপিতদের ছড়া কাটার প্রচলন নেই। তবে অঞ্চল বিশেষে ভিন্নতা আজও আছে। তাছাড়া বর্তমানে যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহ-পূর্ব প্রেম বৃদ্ধি পাওয়ায় কোর্ট ম্যারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়াও বর্তমানে বিবাহে ব্যয়বহুলতা এবং ঝামেলা এড়ানোর জন্য অভিভাবকরাও কোর্ট ম্যারেজ অনেকক্ষেত্রে মেনে নিচ্ছে, ফলে অনেকক্ষেত্রেই বিবাহের সামাজিক অনুষ্ঠানটি বাদ পড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রেজিস্ট্রি ম্যারেজ আজ রাষ্ট্র-স্বীকৃত। তবে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটা নষ্টালজিয়া থাকায় সম্পূর্ণভাবে বিবাহাচারগুলি উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— মধ্যযুগে "শিবের বিয়ে যেভাবে হয়েছিল বার-অ্যাট-ল-র বিয়েও ঠিক সেইভাবেই এখনও ঘটছে।"[৫] আসলে আমাদের অন্তঃপুরটা এবং জাতির সংস্কৃতিগত মানসিকতা সহজে বদলায় না, আর তা প্রোথিত রয়েছে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির অভ্যন্তরে। মৃত্যুর পর আজও সদ্য বিধবাদের আচার পালন করতে হয়, মৃতের পুত্রদের পৈতে ধারণ, সেলাই বিহীন বস্ত্র পরিধান, একখণ্ড লোহা ধারণ, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন আবশ্যিকভাবে পালিত হয়। হয়ত অশৌচকাল এক মাসের স্থলে পনের দিন হয়েছে কিন্তু আজও মৃত্যুর এক বৎসর কাল পর্যন্ত নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে থাকতে হয়।

বর্তমানে হয়ত জাতিভেদ, ছোঁয়াছুয়ি বাছ-বিচার হ্রাস পেয়েছে, আজ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপার প্রায় নেই। ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি ও লাঘব হয়েছে, বিবাহকালে ঘটক ব্রাহ্মণদের তেমন প্রভাব নেই। সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রী কলমে বা ইন্টারনেটে পাত্র-পাত্রী ডট কমে তার চাহিদা পূরণ করেছে। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বা সত্তর-আশি বছর আগে ভেদাভেদ যথেষ্টই ছিল তার প্রমাণ পেতে পারি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে গ্রামীণ সমাজের চেহারা থেকে।

আমোদ-প্রমোদমূলক ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদানগুলি একালের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, নগরকেন্দ্রিক জীবনে তো বটেই গ্রামীণ জীবনেও লোকক্রীড়া ও শরীরচর্চার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেকালে হা-ডু-ডু বা কবাডি, ডাংগুলি, ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের এক্কা-দোক্কা,লুকোচুরি বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়া জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে ছেলেমেয়েদের মানসিকতা ও অবসর খুবই কম, তাছাড়া সঙ্গী-সাথীর অভাবেও যৌথ ক্রীড়াগুলি সম্ভব হয়না। নানা রকম বিদেশী খেলা— ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাটমিন্টন, ভলিবল, লুডো, ক্যারমের দৌলতে লোকক্রীড়াগুলি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। অবশ্য ফুটবল, ক্রিকেট, দাবায় বাঙালী পেশাদারী খেলোয়াড়রা বিশ্বমানেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে খুব সামান্য হলেও লোকক্রীড়াগুলি প্রচলিত রয়েছে। তবে দুভার্গ্যের বিষয় ফুটবল-ভলিবলের মত খেলাগুলিও গ্রাম বাংলার যুবসমাজের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। এক সময় ধনী পরিবারের ছেলেদের কুস্তি, মল্লবিদ্যা ও শরীরচর্চা শেখানো হত বর্তমানে তা হারিয়ে যাচ্ছে; দূরদর্শনের ক্রীড়া চ্যানেলগুলি অথবা ভি.ডি.ও. গেমসের দৌলতে ছেলেমেয়েরা ঘরে বসেই খেলা দেখে, কিন্তু খেলে না। শরীরচর্চার রেওয়াজ প্রায় নেই। গ্রামাঞ্চলে দলবদ্ধভাবে খেলা এখন কদাচিৎ দেখা যায়, শহরাঞ্চলে তাও দুর্লভ। কোথাও কোথাও জিমন্যাসিয়ামে বা পাড়ার ক্লাবগুলিতে শরীরচর্চা কোর্স করানো হয় বা নিয়মিত শরীরচর্চা করানো হয়। এক সময় বাঙালীর সময় চলত ঢিমে চালে, ফলে তাদের প্রচুর সময় থাকত, বালক-বালিকারা অবসরে খেলাধুলা করত; বর্তমানে প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে সময় চলে দ্রুত;ফলে খেলাধূলার অবকাশ খুব কম। জীবনযাপন ও মেলামেশা অনেকটা কৃত্রিম হওয়ার ফলও বাঙালী হারাতে পাচ্ছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের চাইতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে। মধ্যযুগের শিক্ষা অত্যন্ত সীমাবদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল । দর্শন, কাব্যশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ পাঠের মধ্যেই ছিল সারস্বত শিক্ষা। গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস শিক্ষার চল ছিল না।অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে যুগোপযোগী ভাষা হিসাবে ফারসী

শিক্ষার প্রবণতা দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখা যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ফলে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে পরিচয় ঘটে।শিক্ষার নানা দ্বার উন্মোচিত হয়, সাহিত্য, দর্শন ছাড়াও ইতিহাস চর্চা শুরু হয়, তাছাড়া ভূগোল ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন ইত্যাদি নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটে। সাহিত্যে.শুধুমাত্র ব্যাকরণ ও প্রাচীন কাব্য, নাটকই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ নতুন সাহিত্যের পত্তন করে। আধুনিক কোলকাতার ভাষাই তাদের সাহিত্যের মানদণ্ডরূপে গৃহীত হয়। বিদ্যাসাগর, মাইকেল-হেম-নবীন ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রবীন্দ্রনাথের হাতে সাহিত্য নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দু'য়ের দশকে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে 'আধুনিক সাহিত্য' নামে এক নতুন সাহিত্য গড়ে ওঠে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সবই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অন্ধতা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

মধ্যযুগে শিক্ষা ছিল সাধারণত অর্থশালী ধনী জমিদারদের অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠা; ধনীরা তাদের চণ্ডীমণ্ডপে বা পণ্ডিতদের টোলে শিক্ষাদানের পাঠশালা স্থাপন করত। শাসককুল কখনোই জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করত না। আধুনিক যুগের শুরুতেই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের উদ্যোগে নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মুদ্রিত বইয়ের প্রকাশ শিক্ষা জগতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। মধ্যযুগে নারী শিক্ষার আয়োজন ছিল না কিন্তু আধুনিক যুগের শুরুতেই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নব-দিগন্ত উন্মোচিত হল, নারীশিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল। বিংশ শতব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে এল। স্বাধীন ভারতবর্ষে সরকার জনসাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে; আয়োজন ও উপকরণে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি শিক্ষকদের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও শিক্ষকরা নিতান্ত অবহেলার পাত্র ছিল। বুনো রমানাথের গল্প বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে সেকালে শিক্ষকদের দুরবস্থার চিত্র আছে। বর্তমানে সরকার শিক্ষকদের বেতন প্রদানের ভার গ্রহণ করেছে, ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছে। কিন্তু পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। একদা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটা আদর্শবোধের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে শিক্ষা পণ্যে পরিণত হওয়ায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ক্রেতা-বিক্রেতা সুলভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শিক্ষা মানুষ গড়ার মাধ্যম না হয়ে চাকুরী প্রাপ্তির মাপকাঠিতে দাঁড়িয়েছে।

লোককথা, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ-প্রবচনগুলি লোকজীবনের উপাদান। প্রাচীন ও মধ্যযুগে লোকজীবনের অঙ্গ হিসাবে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধাঁ সৃষ্টি হয়েছিল। সেকালের লোকেরা কথায় কথায় প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধাঁ ব্যবহার করত, মুখে মুখে ছড়া কাটতে পারত, সেগুলিই যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে আসত। কিন্তু আধুনিক যুগে গ্রামীণ ও নগরজীবন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে লৌকিক জীবন পরিহার করে নাগরিক জীবনকে গ্রহণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনকার শিক্ষিতা জননীরা ছেলেমেয়েদের রূপকথা, উপকথা, ধাঁধাঁ শোনায় না. তাই শিশুরা কমিকস্ পড়ে, দূরদর্শনে কার্টুন চ্যানেল দেখে। বস্তুত গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ছড়া. প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ রচনার যুগেরও অবসান ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি একালে সকল প্রকার সত্যকে বহন না করলেও অধিকাংশ প্রবাদ-প্রবচনগুলি একালেও সত্য বলেই সমাজে টিকে আছে। তবে একালের নারীরা কথায় কথায় প্রবাদ ব্যবহার করে না; অবশ্য শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে যেখানে গ্রামীণ সংস্কৃতি বেঁচে রয়েছে সেখানে

ক্ষীণভাবে প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁগুলি টিকে থাকলেও নগর জীবনের ছোঁয়ায় ধ্বংসোন্মুখ। তাই বর্তমানে প্রাচীন ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ জনশ্রুতিতে অপেক্ষা না করে লিখিত আকারে প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মৈমনসিংহগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা, গোপীচন্দ্রের গান, ধাঁধাঁ ও প্রবাদ-প্রবচনগুলি সংরক্ষণ করার মানসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। একালেও তার জনপ্রিয়তা এতটুকু নষ্ট হয়নি। মঙ্গলকাব্যগুলিও তাই। বাঙালীর নিজস্ব জীবন বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাপনের মূল সূত্রগুলি আমরা তার মধ্যে খুঁজে পেতে পারি।

আধুনিক যুগে বাঙালী সমাজের বাহ্যিক গঠন অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ গঠন ও মনোধর্মের ক্ষেত্রে বড় রকমের বিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বিগত শতাব্দীর তিন দশকের পূর্বে নারীর অন্দরমহল অবশ্য অনেকটা রক্ষণশীল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে সে সময়কার নারীর দুরবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে নারী সমাজকে যে ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তা থেকে মুক্তির জন্য আধুনিক যুগের প্রারম্ভেই নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন সে সময়কার মনীষীরা। সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ থেকে শুরু করে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারীশিক্ষা প্রচলনের মত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নারী আলোকপ্রাপ্তা হলেও তা সর্বৈব অবস্থা নয়। ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলে নারী মুক্তির ঢেউ লাগলেও কোলকাতা থেকে সুদুর গ্রামাঞ্চলে মধ্যযুগীয় চিরাচরিত ধারাবাহিকতার দ্বারাই নারীকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। নারীরা কোন অবস্থাতেই গৃহের বাইরে যেতে পারত না, এমনকি একই পরিবারে ভাশুর-ভাদ্দর বৌ এর মধ্যে বিধিনিষেধের প্রাচীর ছিল, ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে পাপস্খলন করতে হত। বর্ষীয়সী নারীরা পর্দা দ্বারা আবৃত পালকীতে করে গঙ্গাস্নানে যেত এবং পালকী সুদ্ধ তাদের জলে চুবিয়ে তোলা হত। নারীশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, ছেলেমেয়ে একই বিদ্যালয়ে পড়া তো দুরের কথা যারা বালিকা বিদ্যালয়ে যেত তরাও পর্দাঘেরা গাড়ী বা পালকিতে যাতায়াত করত। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় এরকম অযৌক্তিক ধারণা প্রচলিত ছিল। রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' গ্রন্থে সেকালের নারীর দুরবস্থার ছবি পাওয়া যায়। অবশ্য মাইকেলের কাব্যে সেকালের নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারীর বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীন ভারতবর্ষে নারীর প্রভূত উন্নতি হয়েছে; শিক্ষাদীক্ষা, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, শিল্পকলায় নারীরা যথেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। নারীরা আর সেকালের মত নানা বার-ব্রত পালন করে না, কিন্তু আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকেই নারীর প্রগতিশীলতার পথ নিষ্কন্টক ছিল না। নানা রকম ভাবেই নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। তাই আধুনিক যুগের রক্ষণশীল কবির মুখে নারী প্রগতির বিরুদ্ধে কন্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল—

"আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ী গুলো, তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন "এ,বি," শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।"[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সতীদাহ রদ হলেও কৌলীন্য প্রথা ও বিধবা সমস্যা কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায় এযুগের সাহিত্যে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকে এই সমস্যার ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। তছাড়াও পরবর্তীকালে রচিত কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলীযাত্রা'

উপন্যাস অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত, এগুলিতে ঐ সময়কার নারীর অবস্থান সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যায়।

বর্তমান অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দ্বারা নারী পুরুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। একালের শিক্ষিতা নারী আপন ভাগ্য জয় করার প্রচেষ্টায় বিধাতার ওপর নির্ভর করে না। তারা নিজের গুরুত্বকেও উপলব্ধি করতে শিখেছে। একালের শিক্ষিতা নারী রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় বলতে পারে—

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা-ওঠা
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা॥"[৭]

কিন্তু একটা কথা সত্য যে, সার্বিকভাবে নারীর অবস্থান্তর ঘটেনি।গ্রামাঞ্চলে আজও পরপুরুষ বা একই পরিবারের মধ্যেও পুরুষদের সামনে বধূরা ঘোমটা দিতে ভোলে না, এখনও তারা স্বামী-ভাশুরের নামোচ্চারণ করে না। গ্রামাঞ্চলে তো বটেই অনেক শিক্ষিত পরিবারেও নারীর অবস্থা তথৈবচ। আজও কন্যা সন্তানের ভ্রূণ হত্যা করা হয়ে থাকে। সমাজে বধূ হত্যা ও পণপ্রথার মত কুপ্রথা নারী সমাজকে আজও অবদমিত করে রেখেছে। আজও নারী সম্পর্কিত বিধিনিষেধ পালিত হয়, আজও নারীর সমানাধিকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই একই পরিবারে পুত্রসন্তান অপেক্ষা কন্যাসন্তান অবহেলিত হয়ে থাকে— কাজেই নারী সম্পর্কিত চিন্তাধারা আজও মধ্যযুগীয় অন্ধকারেই ঢাকা রয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে অবশ্য নারীমুক্তি সংগঠনগুলিতে বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বা সাহিত্যে নারীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়। মধ্যযুগের প্রারম্ভে ব্রতকথার যুগেই ধর্মের আড়ালে নারীমুক্তির নিঃশব্দ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মনসা-চণ্ডী-কানড়া-কলিঙ্গারা যথেষ্ট বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে এবং নারীর প্রতিষ্ঠা চেয়েছে। চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলন নারীকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছিল— তারই উত্তরাধিকার বহন করে চললেও আজও নারীমুক্তি আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি।বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামীণ নারী সমাজের নিরিখে বিচার করলে আজও তা বহুদূরেই রয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে একালের নারী সম্পূর্ণভাবে অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না হলেও গ্রামাঞ্চলের নারীরা বেশীরভাগই রান্নাঘরের চার দেওয়ালেই আবদ্ধ। মধ্যযুগের নারীর মত একালেরও বেশীরভাগ নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, এ ব্যাপারে তারা পুরুষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন নারীর প্রকৃত অবস্থান্তর ঘটতে পারে না। নারী সম্পর্কে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যে খুব একটা ঘটেনি তা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। আজও পুরুষরা নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবেই দেখে। তবে এই মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। নারীর পক্ষে পথঘাট আজও খুব একটা নিরাপদ নয়। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ আজকের সমাজেও যথেচ্ছভাবে ঘটে চলেছে। নারী সম্পর্কে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিকতার পরিবর্তন তো হয়ইনি বরং নারী নিজের সম্পর্কেও কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় নারী অপেক্ষাও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে। নারী নিজেই ভোগবাদী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নারী স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেকে ভোগ্যপণ্য করে তুলেছে। অর্থ উপার্জন ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহু ক্ষেত্রে বিকৃত মানসিকতা ও রুচিহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। মনসার মত অবৈধ-জারজ সন্তানরা সমাজে দুর্লভ নয়, একালেও তারা সমাজে অনেকটাই অবহেলিত রয়ে গেছে। ভ্রূণ হত্যা বা গর্ভপাত একালে বৃদ্ধি পেয়েছে বই হ্রাস পায়নি, প্রতিদিনের সংবাদপত্র বা সংবাদ চ্যানেলগুলিতে লক্ষ রাখলে তা বেশ বোঝা যায়। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় এটি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক। মনন-মানসিকতায় আজও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালী মধ্যযুগীয় রয়ে গেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় একালে তা লভ্য নয়। মধ্যযুগে পরিবারগুলি ছিল একান্নবর্তী; সেখানে আত্মীয়-পরিজন, দাস-দাসী থেকে শুরু করে অনেক ধনী পরিবারে ব্রাহ্মণ

পুরোহিতও একত্রে বসবাস করত, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারগুলিতে ভাঙন ধরেছিল। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিতে এই ভাঙনের ছবি আছে। মধ্যযুগে তো বটেই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও বাঙালী পরিবারগুলিতে বহু সন্তান দেখা যেত, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণেই মাইক্রো পরিবারের ধারণা এসেছে। 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার', তাই একালের শিক্ষিতা জনক-জননীরা একটি বা দু'টি সন্তানেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষিত অনেক পরিবারেই এখন ছেলে বা মেয়েতে কোন ভেদ করা হয় না। পরিবার ছোট হয়ে যাওয়ায় একালের ছেলেমেয়েরা শৈশবে ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বা দাদু-দিদিমার সংস্পর্শ বর্জিত এবং খুড়তুত-জ্যেঠতুত ভাইবোনদের সংস্পর্শ না পাওয়ায় তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও কমে গেছে। তবে শহুরে জীবনযাপন অপেক্ষা গ্রামীণ জীবনযাপনে এখনও অনেকখানি বাঙালীর জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রামীণ জনজীবনও সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাঙালীর পারিবারিক সম্পর্কগুলিতে শাশুড়ী-পুত্রবধূ, ননদ-ভাজ, দুই সতীন কিংবা বিমাতা-সপত্নীজাত সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন হয়নি; আজও এই সম্পর্কগুলি মধুর নয়। মধ্যযুগে বাংলার গ্রাম একেকটি বৃহৎ পরিবারের মত ছিল, সেখানে আধুনিক যুগে পাড়া বা নিকটতম প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যেত উৎসব অনুষ্ঠানে সমগ্র গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠত, একালে তা একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে মধ্যযুগীয় জাতিভেদ প্রথায়। আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকে বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল, এমন কি একালেও আছে, কিন্তু চতুঃবর্ণ প্রথা বা ছত্রিশ বর্ণ ভেদ অনেকটাই মূল্যহীন হয়ে গেছে। বস্তুত এ কালে সামাজিক পরিচয় অপেক্ষা মানুষের ব্যক্তি পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে; তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভেদ নেই বলা চলে। ব্রাহ্মণের মধ্যে কিছুটা জাতিগত সচেতনতা থাকলেও তা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণরা সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও অবস্থান অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করেছে। যজন-যাজন বৃত্তির ব্রাহ্মণ একালে খুব কম চোখে পড়ে, বরঞ্চ বলা যায় পূজা-পার্বণে পূজারী পুরোহিত পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সকল বর্ণের মানুষ একত্রে আহার করা মধ্যযুগে দুষ্কর ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম পানিহাটিতে সকল বর্ণের মানুষের একত্রে পঙ্‌ক্তি ভোজনের ব্যবস্থা করে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন, তাঁর কীর্তনের আসরগুলি সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। একালে সকল বর্ণের মানুষ নির্বিবাদে পঙ্‌ক্তি ভোজন করে থাকে। তাছাড়া আইনগতভাবে জাতিভেদ করা, মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করা অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। শিক্ষার প্রভাবে তথাকথিত অন্ত্যজরাও আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে; নিজের স্বাধীকার ও অধিকার বোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের ভেদাভেদ অনেক মুছে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সরকারীভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের চিহ্নিত করে মানুষকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- আদিবাসী, তফশিলী, অন্যান্য অনগ্রসর এবং সাধারণ । পিছিয়ে পড়া মানুষদের চিহ্নিত করে সরকারীভাবে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমেও পিছিয়ে পড়া মানুষকে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক সম্পর্কগুলিতে দেখা যায় অনেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, ফলে জনমিশ্রণের সুযোগ একালে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত বাঙালী হিন্দুই নয়, অনেকক্ষেত্রে মুসলিম, খ্রীষ্টান, বিদেশী-দেশী সকলের মধ্যে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ বেড়েছে। একালে কেউ জাতিগতভাবে তথাকথিত হীন নয়,মধ্যযুগে তো বটেই বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন কারণে নিম্নবর্ণের মানুষ বা সামাজিক কারণে একই বর্ণের অন্তর্গত মানুষের ধোপা-নাপিত বন্ধ করে সামাজিকভাবে অবরোধ করা হত. একালে এগুলি হাস্যকর ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। শিক্ষার বিস্তার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের ফলে মানুষের মূল্য প্রায় সমান হয়ে গেছে। অর্থ কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অর্থের মানদণ্ডে মানুষের মূল্য

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই অনেক দিন আগেই বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্য' গ্রন্থে অর্থ কৌলীন্যের দ্বারা মানুষের মূল্য বিচারের কথা বাঘ্রচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের মুখে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকেই, তাই একালেও মানুষ যথার্থ সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, সমাজের অন্তঃস্থলে দুষ্ট ক্ষতের মত রয়ে গেছে জাতিভেদ। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে জাতিভেদ প্রথার কথা পাওয়া যাচ্ছে। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' ও অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। একালেও তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ অনগ্রসর শ্রেণীর বা তথাকথিত অন্ত্যজদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় তো বটেই, শিক্ষিত শহুরে সমাজেও রক্ষণশীলতা দেখা যায়। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও গ্রহ-নক্ষত্র, ঠিকুজি কিংবা জাতিগত প্রশ্ন তুলে থাকে। রক্ষণশীল পরিবারের অচলায়তনে আজও মুক্তির বাতাস লাগেনি।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রটি আজও যে মধ্যযুগীয় রয়ে গেছে তা একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। মধ্যযুগে মুসলমান শাসক সম্প্রদায় হিন্দুর উপর নিপীড়ন করলেও সাধারণ মানুষ মিলে মিশে বসবাস করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানরা নিজেদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। বস্তুত মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মীয় ও অন্যান্য কারণে হিন্দুসমাজ অপেক্ষা পিছিয়ে পড়েছিল, ফলে মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা তাদের জন্য পৃথকভাবে চিন্তাভাবনা করেন। বেগম রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেনের মত শিক্ষাব্রতী মুসলমান মহিলারা মুসলমান সমাজের উন্নয়নের জন্য লেখনী ধারণ করেন। হিন্দু-মুসলমানের এই ভেদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা- হাঙ্গামা বৃদ্ধি পায় এবং সব চাইতে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তাতেও কিন্তু সমস্যার শেষ হয়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি পেয়েছে বই হ্রাস পায়নি। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ সমস্যাকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যপূর্ণ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হলে পৃথক পৃথক দাঙ্গায় প্রচুর হিন্দু-মুসলমান প্রাণ হারায় দুই বঙ্গেই। তসলিমা নাসরিন তাঁর 'লজ্জা' উপন্যাসে এর বিবরণ দিয়েছেন। তার অনেক আগে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্থান বা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ে নির্বিচারে হিন্দু জনগণকে হত্যা করা হয়েছিল, মুসলমান হত্যাও কম হয়নি। বর্তমান বাংলাদেশের বহু শরণার্থী ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সে সময়ে। তাছাড়া স্বাধীনতার ছাপান্ন বছরেও হিন্দু-মুসলমান সমতা আইনের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই মুসলমানদের জন্য পৃথক আইন সংস্থা রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানকে একই শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসা যায়নি। কাজেই বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও তাদের সম্পর্ক মধ্যযুগ অপেক্ষা ভাল একথা দাবী করা যায় না।

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রটি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে, বস্তুত এই দু'টি ক্ষেত্রে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের বোধহয় তুলনা চলে না। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর নয়। অবিভক্ত বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গ কৃষি প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প ও কৃষি প্রধান ছিল। বর্তমানে শিল্প ও বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি হলেও কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে অনেক কম। তবে উন্নত চাষ পদ্ধতি উচ্চ ফলনশীল বীজ ও সারের ব্যবহারে আধুনিক কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শিবায়নে যে ধানের নাম পাই, আজ সেগুলি স্মৃতি মাত্র। উচ্চ ফলনশীল বীজ পূর্বের ঐতিহ্যশালী শস্যকে সরিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে উন্নত উচ্চ ফলনশীল ধান— জয়া,রত্না, পদ্মা, আই-আর-এইট ইত্যাদি চাষ হয়। ধান ছাড়াও গম, আলু, ডাল, শাকসবজি, ফল ইত্যাদির উন্নত বীজের ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। পশুপালনে বেশী হারে মাংস, দুধ ও ডিম প্রদানকারী গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন করা হয়। বেশী ডিম ও মাংস পাওয়ার জন্য পোলট্রি প্রথায় হাঁস, মুরগী পালন করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদন বর্তমানে একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। মানুষের পশুপালন প্রবণতা কমে গেলেও ডেয়ারী শিল্পগুলি দুধের চাহিদা

মেটায়। বর্তমানে বাংলার নদীনালা ও খালবিলে মাছের সংখ্যা ভয়ানকভাবে কমে গেছে, এর কারণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ ধরা। তাই জনগণ ও সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার সঙ্কর মাছ চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশীয় মাছের জায়গায় বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক মাছ রসনা পরিতৃপ্তি করছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার প্যাকেটজাত মাছ,মাংস ও দুধে বাজার ভরে যাচ্ছে। সরকারী সহয়তায় গ্রাম সংসদ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী পশুপালন ও চাষবাস করে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে পারছে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে কৃষকের অবস্থা যেমন ভাল ছিল না তেমনি কৃষিও আদিম পদ্ধতিতেই হত। কৃষকরা জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা ক্রমাগত শোষিত হত; বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে সে তথ্য তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও বাংলাদেশের চাষবাস হয় আদিম পদ্ধতিতেই । আজও কৃষককে চাষের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হলে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না, কৃষক উৎপাদিত ফসলের নায্য মূল্য পায় না। ফলে একালেও প্রতি বছর অনেক কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার ফলে গ্রাম বাংলার সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক-মজুরদের অবস্থার উন্নতি ঘটলেও সবার এক অবস্থা নয়। মধ্যযুগে বাংলার সমৃদ্ধশালী কুটীরশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আজও বাঙালী সমাজে সমান জনপ্রিয়। বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এবং বিদেশেও বাংলার কুটীরশিল্প সমাদৃত হচ্ছে।

বাঙালীর ধর্মীয় জীবনের স্বরূপ মধ্যযুগ অপেক্ষা একালে আরও সঙ্কর আকার ধারণ করেছে। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব তিনটি ধর্মীয় বিশ্বাসে বিভক্ত বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে আধুনিক যুগের শুরুতেই রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের সূত্রপাত করেন; অবশ্য ব্রাহ্মধর্ম কোন ধর্ম বিশেষ নয়, সকল ধর্মের সম্মিলিত একটি নতুন রূপ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয়, এর উদ্দেশ্য হল পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থান; এই পর্বটিকে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম এর যুগ বলা হয়। এ পর্বের সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যকর্মে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা করেন। গিরিশচন্দ্রের মত নাট্যকার মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ প্রচার করেন তাঁর পৌরাণিক নাটকাবলীতে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ এবং শ্রী অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে শাক্তধর্ম নতুন মাত্রা পায়। স্বামী বিবেকানন্দ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চিকাগোর ধর্মীয় সম্মেলনে হিন্দুধর্মকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। আধুনিক যুগ কিন্তু ভক্তিবাদ বা দৈববাদের যুগ নয়– নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক যুক্তি শৃঙ্খলার দ্বারা যাচাই করাই এই যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সনাতন বাঙালীর ঘরে ঘরে দৈববাদ-ভক্তিবাদ মুছে যায়নি। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাব আজও সমানভাবে রয়েছে। আজও প্রকৃতিগত ভাবে বাঙালী পঞ্চোপাসক; বাঙালীর ঠাকুরঘরে প্রায় সকল দেবতার সমান অধিষ্ঠান। গ্রামীণ সমাজে বার-ব্রতের পরিমাণ কমে গেলেও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে। আরোগ্য কামনায়, বৃষ্টি বা শস্য কামনায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা হয়। অবশ্য বর্তমানে শিক্ষিত বাঙালী ধর্মকেও যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করেছে। ব্যক্তিবাদের বিকাশের ফলে ধর্মীয় উন্মাদনা বা দৈব নির্ভরতা শিক্ষিত সমাজে হ্রাস পেয়েছে, তাহলেও সাধারণ বাঙালী সমাজে ধর্মীয় উন্মাদনা একেবারেই মুছে গেছে তা নয়, মাঝে মাঝেই তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। বস্তুত একালের শিক্ষিত বস্তুবাদী বাঙালী ধর্মকে কিছুটা সঙ্কীর্ণতা মুক্ত করে সংস্কৃতির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তাই একালে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকল ধর্মের ধর্মানুষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণীর মানুষ সমানভাবে সমবেত হয়ে থাকে। সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব জীবনে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় ঠাকুর দেবতার নামে নামকরণ করার প্রবণতাও কমে গেছে । পূজা-পার্বণে ধর্মীয় আচার ও ভক্তি বা নিষ্ঠার পরিবর্তে জৌলুস বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক যুগে মানুষের মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের স্থানটি গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রপূজার প্রতি আগ্রহ বা রাজনৈতিক উন্মাদনা। মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী দেবদেবীদের স্থান দখল করেছে একালের রাষ্ট্রনায়কগণ। আধুনিক যুগে ধর্ম ও রাজনীতি অনেকটা সমার্থক হয়ে গেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে জনগণকে নিষ্ক্রিয় করে দেবদেবীরা যে নিয়ন্ত্রণ

নীতি চালাত সেভাবে জনমতকে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও দলীয় ব্যবস্থার অনুবর্তী ও নিষ্ক্রিয় করে রাখার সর্বাত্মক কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। দেবদেবীদের মতই বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে জনগণকে ভয় দেখানো বা বলপ্রয়োগ করে বশীভূত রাখা হয়। সুতরাং আধুনিক শিক্ষিত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নীতি বা রাষ্ট্র পরিচালকদের মতামত মধ্যযুগীয় ধর্মের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপদেবতা বা উপদেবতা বা অনিষ্টকারী শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শক্তিগুলি জনজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। সেখানে মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা ও স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে।

বস্তুত কোন সমাজই স্থিতিশীল নয়, নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলাই সমাজের ধর্ম। কিন্তু এই বিবর্তন সর্বদা স্থূলভাবে চোখে পড়ে না। সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক চরিত্র একত্রিত হয়ে যে সমাজ-চরিত্র গড়ে ওঠে তা রাষ্ট্রনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, বিবর্তিত হয়। প্রাচীনযুগীয় বাঙালী সমাজ মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছে। মানব সমাজ নানা পরিবর্তন ও পরিশীলনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হলেও, একথা বলা যায় মানুষের বর্তমানের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে তার প্রাচীনতম মিথটি; এবং ভিন্নতর অবস্থায় তার প্রকাশও ভিন্নতর। মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে একালের জীবনযাত্রার তুলনা চলে না, তবে লক্ষণীয় বিংশ শতাব্দীর দু'-তিনের দশকের আগে বাঙালী মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রাকে ত্যাগ করতে পারেনি। একালেও গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় জীবনের প্রভাব রয়েছে। বাঙালীর সংস্কৃতি-রীতি-রেওয়াজ, বিশ্বাস-সংস্কারের মূল প্রোথিত রয়েছে মধ্যযুগেই, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে হলেও তার রূপ-রস মধ্যযুগীয় সমাজ ইতিহাসের মধ্যে থেকেই পাওয়া যায়। কাজেই যাকে বিবর্তন বলা হচ্ছে সেটা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের শুরু পর্যন্ত ততবেশী ক্রিয়াশীল নয়। বর্তমানে বাঙালী সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, যা শুধু শহুরে জীবনই নয় গ্রামীণ জীবনকেও প্রভাবিত করছে, ফলে বাঙালী সমাজ দ্রুত তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। পশ্চিমী দুনিয়ার হাতছানি গ্রাম বাংলার জনজীবনকেও স্পর্শ করছে। পরিবর্তন বা বিবর্তন ইতিহাসের নিয়তি, কিন্তু অতি দ্রুত বিবর্তন জাতির ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করতে পারে, তাই বাঙালীর স্বকীয়তা রক্ষার্থে তার সংস্কৃতিগত ও ঐতিহ্যগত অনুশীলন প্রয়োজন। কেননা মানুষ যদি তার ঐতিহ্য ভুলে যায়, তার সংস্কৃতির সংরক্ষণ না করে, তবে তো জাতি হিসাবে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পরবর্তী প্রজন্ম জানতেও পারবে না আমরা কী ছিলাম, কোথা থেকে এলাম।

তথ্যপঞ্জী

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, পৃ :৭।

২। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ডঃ অতুল সুর, পৃ : ৩৫৯।

৩। ভোজন শিল্পী বাঙালী, বুদ্ধদেব বসু, 'প্রসঙ্গত'-অংশ।

৪। বাংলার সঙ্গীত, রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'পরিচিতি' অংশ।

৫। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ : ১২।

৬। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ : ৯১।

৭। সঞ্চয়িতা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ : ৫৫৫।